ধনঞ্জয়ের ফাঁসি
এবার ফিরে দেখছে ওর গ্রাম

বাঁকুড়ার ছাতনা কামারকুলি মোড়ে গত ২৪ জানুয়ারি এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই মোড় থেকে তিন কিলোমিটার দূরে কুলুডিহি; সেই গ্রামের ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রায় সবাই শুনেছেন। ধনঞ্জয়কে চোদ্দো বছর কারাবাসের পর ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল ২০০৪ সালের ১৪ আগস্ট। স্কুল-ছাত্রী একটি মেয়ে হেতাল পারেখকে খুন, ধর্ষণ আর ঘড়ি চুরির অভিযোগে সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। ছাতনার পথসভা হয়েছিল সেই মামলার পুনর্বিচারের দাবিতে। সভার উদ্যোক্তা ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)।

সভার শুরুতে এপিডিআর-এর তরফে অরিজিৎ গাঙ্গুলি জানান ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটের দুই অধ্যাপক দেবাশিস সেনগুপ্ত ও প্রবাল চৌধুরী গত এগারো-বারো বছর ধরে অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, যে-সব পারিপার্শ্বিক প্রমাণের জোরে ধনঞ্জয়ের সাজা হয়েছিল, সেগুলো প্রায় সবই ভুয়ো। এমনকী ধনঞ্জয় আদৌ এই খুন করেনি, এমন সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁদের নিরীক্ষা থেকে। মামলার পুনর্বিচারের দাবি নিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে সেই কারণেই।

দেবাশিস সেনগুপ্ত বলেন, 'আজকে আমরা সমবেত হয়েছি ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নামে। যার ফাঁসি হয়েছিল হেতাল পারেখ নামে এক স্কুল ছাত্রীকে খুন করার দায়ে। এই বিষয়ে কোনো আলোচনা করার আগে মূল ঘটনা কী ছিল একটু স্মরণ করে নেওয়া দরকার। উপস্থিত অনেকেই হয়তো এই কাহিনির কিছুটা জানেন, কিছুটা জানেন না।

হেতাল পারেখ কলকাতায় পদ্মপুকুরের এক ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকত। চারতলায় সেই ফ্ল্যাট। ওঠানামার লিফট ছিল। লিফটের পাশে সিকিউরিটি গার্ড পাহারায় থাকত। ধনঞ্জয় ছিল একজন গার্ড। ঘটনার দিন দুপুরের পর থেকে হেতালের বাবা আর দাদা পারিবারিক দোকানে। সকালে পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পর থেকে বাড়িতে শুধু হেতাল আর তার মা। বিকেলে কিছুক্ষণের জন্য মা মন্দিরে যান। তিনি ফেরার পর ডাকাডাকি সত্ত্বেও ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজা কেউ খোলেনি। লোকজন জড়ো হলে দরজা ভেঙে দেখা যায় হেতাল খুন হয়ে পড়ে আছে। খুনটা কেউ হতে দেখেনি। তিন ঘণ্টা পর পুলিশ আসে। পারেখদের তরফে ধনঞ্জয়ের নামে ধর্ষণ আর খুনের অভিযোগ করা হয়। আর বলা হয় ধনঞ্জয় নাকি বেপাত্তা। পুলিশ সেই কথা তখনই সাংবাদিকদের জানায়। পরদিন সব কাগজে ধনঞ্জয়ের নাম বেরোয় পলাতক খুনী হিসাবে। সেদিন, মানে খুনের পরদিন, রাতে কুলুডিহিতে ধনঞ্জয়ের বাড়িতে ছাতনা থানা থেকে পুলিশ খোঁজখবর করতে যায়। তার পরদিন ধনঞ্জয়ের ভাই বিকাশের পইতের অনুষ্ঠান ছিল। ধনঞ্জয় উপস্থিত ছিল না। অনুষ্ঠানের পর রাতে সেখানে কলকাতার লালবাজার থেকে পুলিশদল এসে তাণ্ডব চালায়। বাড়ির লোকজনকে মারধর করে। ভয় দেখায়, মেয়েদের তুলে নিয়ে যাবে। গোটা গ্রাম সন্ত্রস্ত। এরপর ক-দিন বাদে বাদে পুলিশ হানা দিতে থাকে। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে তল্লাশি চলতে থাকে। দু-মাস পরে ধনঞ্জয় গ্রেপ্তার হয় কুলুডিহি থেকেই।

কেস যখন কোর্টে উঠল, বলা হল তিনজন সাক্ষী ধনঞ্জয়কে খুনের দিন বিকেলে ওই ফ্ল্যাটে দেখেছে। হেতালের মা যখন বাড়ির বাইরে, সেই ফাঁকে ধনঞ্জয় নাকি টেলিফোন করতে ওই ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। বলা হল, ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে পোস্ট মর্টেমে। বলা হল, খুনের জায়গা থেকে ধনঞ্জয়ের জামার বোতাম আর গলার চেন পাওয়া গেছে। ওই ফ্ল্যাট থেকে চুরি যাওয়া লেডিজ হাতঘড়ি ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে নাকি উদ্ধার হয়েছে। সরকার পক্ষে ২৯ জন সাক্ষী দাঁড়ায়, উল্টোদিকে একা ধনঞ্জয়। দায়রা আদালতে ফাঁসির আদেশ হয়। স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ-খুন — জঘন্য, বিরলতম অপরাধ; তাই ফাঁসির সাজা। হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টে সেই সাজা বহাল থাকে। আদালত, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি সবার কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করে ধনঞ্জয় নিজে, পরে তার স্ত্রী, মা, ভাই। কলকাতা-দিল্লির আদালতে দৌড়োদৌড়ি সব ব্যর্থ হয়। ২০০৪ সালের ২৫ জুন থেকে ফাঁসি একবার পিছিয়ে যায়, কিন্তু শেষে সেইবছরই ১৪ আগস্ট ফাঁসি হয়ে যায়।

ফাঁসির সময়ে কাগজে খবর দেখে আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। ফাঁসির দিন তিনেক পরে আমাদের বন্ধু পরমেশ গোস্বামী ছাতনা আসেন। ধনঞ্জয়ের বাবা বংশীধরবাবুর সঙ্গে কথা বলেন। উপস্থিত অনেকের সঙ্গে কথা বলেন। ফিরে গিয়ে জানান, এখানকার কেউ বিশ্বাসই করে না যে ধনঞ্জয় এমন কাজ করতে পারে। বড়ো একটা গোলমাল হচ্ছে কোথাও। তখন আমরা কেস সম্বন্ধে খোঁজখবর নিই। কেসের কাগজপত্র জোগাড় করে খুঁটিয়ে পড়ি। সেই সময়কার সব খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ি। খুন যেখানে হয়েছিল সেই আনন্দ অ্যাপার্টমেন্ট দর্শন করি। পুলিশ অফিসার যাঁরা তদন্ত করেছেন, পোস্ট মর্টেম ডাক্তার, ফরেনসিক বিজ্ঞানী, মামলার সাক্ষী, পদ্মপুকুরে হেতালদের প্রতিবেশী, কুলুডিহিতে ধনঞ্জয়ের আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী, জেলে ধনঞ্জয়ের প্রতিবেশী, জেলের ডাক্তার, ধনঞ্জয়ের উকিল, ধনঞ্জয়ের সহকর্মী সিকিউরিটি গার্ড, সবার সঙ্গে কথা

বলি। অন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলি। সব কিছু খতিয়ে দেখে বুঝি, ধনঞ্জয় নির্দোষ।

সম্পূর্ণ সাজানো কেস। মাত্র আধঘণ্টা সময় হেতালের মা নাকি ছিলেন না। এইটুকু সময়ে ধর্ষণ, বাইশটা আঘাত করে খুন, চুরি — এত কাণ্ড সেরে কেউ বেরিয়ে যাবে, তার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, লোকে দেখে কিচ্ছুটি বুঝবে না — এমন হতে পারে না। তা ছাড়া সুরক্ষিত চারতলার ফ্ল্যাট, বাইরের কারো ঢুকতে পারারই কথা নয়। একটু খোঁজ নিতেই বোঝা গেল, দুই সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। তিন নম্বর সাক্ষী তো আদালতেই উল্টো কথা বলেছে। তাহলে দাঁড়াল এই, ধনঞ্জয়কে খুন করতে কেউ দেখে নি, ফ্ল্যাটে ঢুকতেও কেউ দেখে নি। বাকি রইল বোতাম, ঘড়ি আর চেন। ঘড়ি চুরির প্রমাণই হয়ে দাঁড়াবে ধর্ষণ খুনের প্রমাণ! অথচ এটাও বোঝা যাচ্ছে, বোতাম, ঘড়ি সব ভুয়ো। ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে পুলিশ একটা নতুন জামা চেয়ে নিয়ে গেল, রক্তের দাগ কিচ্ছু পাওয়া গেল না, সেটা হয়ে গেল খুনের জামা। লালবাজারের পাশে রাধাবাজারে অনেক ঘড়ির দোকান, সেখানকার একটা ঘড়ি দেখিয়ে বলল ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে পেয়েছে। জামা-ঘড়ি সিজ করার সময় সাক্ষী থাকার কথা বাড়ির আশেপাশে কারুর। মানে কুলুডিহির। পুলিশ বলল তারা সাক্ষী সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল ছাতনা থেকে। কেমন সাক্ষী? তার মধ্যে একজনকে আদালতে হাজিরই করা গেল না। আর একজন হল থানায় চা দিয়ে যায় এমন এক যুবক। সে নাকি গ্রেপ্তারের দলে ছিল। এরকম একজনকে নিরপেক্ষ সাক্ষী বলা যায় কি? সে তো পুলিশ যা বলতে বলবে তাই বলতে বাধ্য। সে যে গ্রেপ্তারের দলে ছিল না তার প্রমাণ আছে। ধনঞ্জয়কে কোথা থেকে খুঁজে পাওয়া গেছিল তাই নিয়ে তার কথার সঙ্গে অফিসারের কথা মেলেনি। থানার মেজোবাবুর কথাও মেলেনি। একজন বলেছে ধনঞ্জয় খড়ের চালে শুয়ে ছিল, আর একজন বলেছে সে খড়ের গাদার পিছনে বসে ছিল। এরা একই দলে গিয়ে থাকলে এক একজন এক একরকম বলবে কেন?

নারী নির্যাতনের গল্পও মিথ্যা। খুন তো হয়েইছে, নৃশংস খুন। কিন্তু পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে যে বাইশ দফা আঘাতের কথা আছে, সব মাথায় মুখে ঘাড়ে। খুন ছাড়া অন্য যে ঘটনার জন্য এটাকে জঘন্য বিরল অপরাধ বলা হল, তার চিহ্নমাত্র নেই। পোস্ট মর্টেম ছাড়াও ফরেনসিক পরীক্ষা হয়েছিল। এই দুটো পরীক্ষার রিপোর্ট কেউ মিলিয়ে দেখেনি। দেখলে পরিষ্কার বোঝা যেত, এটা সেরকম কেস নয়। খুনের দু-এক ঘণ্টা আগে সম্ভবত আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। এমন ঘটনা যা জানতে পারলে বাড়ির লোক রেগে আগুন হয়ে যেতে পারে। শুধু শুধু বলা হল, সেটা জবরদস্তি করে হয়েছে, ওটাই ধর্ষণ, ধনঞ্জয় করেছে।

কেন এমনটা হল? পুলিশের সঙ্গে আসল খুনীদের যোগসাজস হয়েছে এমন কথা আমরা কিন্তু বলছি না। পুলিশ ভুল ভেবেছে। কেন ভেবেছে? হেতালের বাড়ির লোক ধনঞ্জয়ের নাম করেছিল বলে, আর ধনঞ্জয় পালিয়েছিল বলে। সত্যিই কি পালিয়েছিল? ভাইয়ের পৈতেয় তো ওর এমনিতেই বাড়ি আসার কথা ছিল। সেদিন না হোক পরের দিন। একটা খুন হয়ে গেছে, পুলিশ ধরে টানাটানি করবে, বাড়ি যাওয়া ভেস্তে যাবে, এই অবস্থায় লোকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তেই পারে। তাই বলে হেতালের বাড়ির লোক বলেছে বলেই ঘোষণা করা হবে ধনঞ্জয় খুনী, তাই পালিয়েছে? ওটা তো ওর বাড়ি নয়, তখনকার ডিউটির জায়গা নয়, ওখানে অকারণে তাকে থাকতে হবে কেন? আমার অফিসে আজ সকালে খুন হলে বলা হবে, আমি অফিসে নেই তাই আমিই খুন করে পলাতক? আসলে ধনঞ্জয় পালিয়েছে কি পালায়নি জানার আগেই পুলিশ ঘোষণা করে দেয়, সে খুন করে পালিয়েছে। কাগজে কাগজে খবর বেরোয়। ধনঞ্জয় খুনী, ধর্ষক, তাকে পুলিশ খুঁজছে। তারপর পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া ধনঞ্জয়ের আর উপায় কী।

পুলিশ তো ভুল করে ধনঞ্জয়কে সন্দেহ করল। কিন্তু শুধু সন্দেহের বশে অভিযোগ, সে অভিযোগ আদালতে টিকবে কী করে? আদালতের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে অনেকেরই ধারণা নেই। আমাদেরও ছিল না। আদালত আর পাঁচটা সরকারি অফিসেরই মতো। সেখানে আসল কথা হল কাগজ। কাগজই সব। কাগজপত্র সাজাতে পারলে তবে ঠিক বিচার হয়। পুলিশ চাইলে ঠিকমতো তদন্ত করে কাগজ সাজাতে পারে। সে সুযোগ তাদের আছে। কিন্তু অনেক কেসে চাপ থাকে বলে পুলিশ ভালো করে তদন্ত করতে পারে না। সালমান খানের মতো লোকজন মানুষ মেরেও ছাড়া পেয়ে যায়। তাই অন্য কেসে পুলিশকে কাজ দেখাতে হয়। এত খুন হয় চারদিকে। অন্তত কিছু লোককে দোষী প্রমাণ করে শাস্তি দিতে না পারলে প্রশাসন আর বিচার ব্যবস্থার ওপর লোকের ভরসা থাকবে না। তাই মাঝে মাঝে কিছু লোকের দোষ প্রমাণ হওয়া দরকার। কেমন করে হবে? কেস সাজিয়ে হবে। পুলিশ যাকে সন্দেহ করছে, বিচারকরা যাতে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করেন তার জন্য সাক্ষীসাবুদ সাজাতে হয়। সাজানো সাক্ষী। সাজানো প্রমাণ। সে ক্ষমতাও তাদের আছে। মিথ্যা করে সাজানোর মতো আইনের সুবিধা আছে। গোয়েন্দা পুলিশ এই কাজটা খুব ভালো পারে। তদন্ত ভালো করতে পারে তা নয়। যাকে সন্দেহ হচ্ছে, তাকে আচ্ছা করে ফাঁসাতে পারে। ধনঞ্জয়ের বেলায় এটাই ঘটেছিল।

পুলিশ কত খারাপ আমরা কিন্তু সে কথা বলছি না। পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখে। এই সভার জন্য যেমন। অনেক সময় পুলিশকে মানুষের বিপদে সাহায্য করতে দেখা যায়। পুলিশ আপনার আমার মতো সাধারণ লোক। সাধারণ লোক স্থান কাল বুঝে আচরণ করে, পুলিশও তাই। সাধারণ ছাত্র পরীক্ষা দিতে গিয়ে যদি টুকে পাশ করার সুযোগ পায়, তাহলে সে সেই সুযোগ নেবে না কেন? কষ্ট করে পড়াশোনা সে করবে কেন? পুলিশ যদি কষ্ট করে তদন্ত না করে শুধু সাক্ষীসাবুদ সাজিয়ে মামলা পেশ করার সুযোগ পায়, ভালো করে তদন্ত করার ইচ্ছে তার হবে কেন? আসল কথা হল, বর্তমান ব্যবস্থায় পুলিশের সেই সুযোগ আছে, ছাত্রের যেমন টোকার সুযোগ থাকে। ছাত্র টুকে পাশ করলেও ক্ষতি হতে পারে। বড়ো রোগ হলে টুকে পাশ করা ডাক্তারের হাতে চিকিৎসা হোক, আমরা কেউ কি চাই? তেমনি ঠিকমতো তদন্ত না করে কেস সাজানোর সুযোগ যদি থাকে, তা হলে তার থেকে আপনার আমার যে কোনো লোকের বিপদ হতে পারে। ভুল করে জেল। ভুল করে যাবজ্জীবন। ভুল করে ফাঁসি। ধনঞ্জয়ের যেভাবে ভুল করে ফাঁসি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে,

সেভাবে আজ বাদে কাল আর একজনেরও শাস্তি হতে পারে।

অবস্থাটা ভয়ংকর। ধনঞ্জয়ের প্রাণ গেছে। এরকম চলতে দিলে আমাদেরও যেতে পারে। এ কেমন ব্যবস্থা? সাধারণ লোককে চাপ দিয়ে সাক্ষী বানিয়ে আর একজন সাধারণ লোককে ফাঁসানো। আসল খুনী পার পেয়ে যাবে। যাকে ফাঁসানো হল, বাঁচার জন্য সে উকিল দাঁড় করাবে। মামলার ডেট পড়বে বার বার। উকিলকে টাকা দিতে হবে জমি বন্ধক রেখে। ঘটিবাটি বন্ধক রেখে। হাতে পায়ে ধরে বলতে হবে, স্যার আর একটু কমে হয় না? স্যার নিমরাজি হবেন, কিন্তু মামলার কাগজপত্র ভাল করে পড়বেন না। আগের দিনের সাক্ষী কী বলেছিল, পরের দিন সেটা ভুলে যাবেন। নতুন সাক্ষী উল্টো কথা বলছে কিনা — ধরতেই পারবেন না। রায় হয়ে যাবে গরিব লোকের বিরুদ্ধে। হাইকোর্টে আপিল করতে গেলে কোর্ট বলবে, একথা আগে বলনি কেন? কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, সুযোগ থাকতে তোমার উকিল আপত্তি করেনি। এখন বললে তো হবে না! গরিব লোক তাহলে যাবে কোথায়? কে আছে তার সহায়?

ধর্ষণ খুন জঘন্য অপরাধ। শাস্তি দরকার। তার মানে কি হাতের কাছে যাকে পাব তাকেই শাস্তি দিতে হবে? আমার মেয়ের উপর যদি অত্যাচার হয়, সে যদি খুন হয়, তাহলে দুম করে রাস্তা থেকে একটা লোককে ধরে ঝুলিয়ে দিলেই কি শান্তি পাব? নির্দোষ মেয়ের খুনের বদলে আর একটা নির্দোষ লোকের প্রাণ কেড়ে নিয়ে শান্তি পাব?

এরকম একটা ব্যবস্থায় কেউ নিরাপদ নয়। গরিব মানুষের বিপদ সবচেয়ে বেশি। ধনঞ্জয় বলেছিল, গরিব বলেই তার ফাঁসি হচ্ছে। কথাটা একদম ঠিক। এই বিপদ ঠেকানো দরকার। বলা দরকার, ধনঞ্জয়দের যেমন খুশি ফাঁসিয়ে দেওয়া চলবে না। সরকারকে বলা দরকার, স্বীকার করো তোমরা ভুল করেছ। নতুন করে মামলার তদন্ত করো। আসল খুনীকে খুঁজে বার করে তার বিচার করো। এক বার ফেল করেছ, আর একবার চেষ্টা করে পাশ করো। মহামান্য আদালতকে বলা দরকার, আপনারা মন দিয়ে খুঁজে দেখুন, নির্দোষ মানুষের রক্ত আপনাদের হাতে লেগে গেল কিনা। কী করে সেটা হল। অনেকে মিলে বললে কিছু কাজ হতে পারে। ধনঞ্জয়ের প্রাণ আর ফিরবে না। কিন্তু এই বেপরোয়া ব্যবস্থাটাতে একটু ব্রেক কষা হবে। তাতে আপনার আমার প্রাণ বাঁচতে পারে।

আমরা শিক্ষক। ছাত্র পড়াই, অঙ্ক কষি। তদন্ত করা আমাদের কাজ নয়। ধনঞ্জয়ের ফাঁসি দেখে আমাদের মনে হল কিছু করা দরকার। তাই আমরা বইয়ের অঙ্ক ছেড়ে ধনঞ্জয়ের কেসের অঙ্ক কষলাম কয়েক বছর। জানলাম, ধনঞ্জয় সম্পূর্ণ নির্দোষ। জানলাম আমাদের আইন, গোয়েন্দা পুলিশ আর বিচারব্যবস্থা মিলে কীভাবে নির্দোষ একটা মানুষকে খুন করেছে। তখন মনে হল, আমরা যা জেনেছি, সবাইকে জানানো দরকার। একটা বই লেখা হল। আরও বিস্তারিত একটা বই লেখা চলছে। খবর ছড়াচ্ছে। নানা লোকে জেনেছে। এপিডিআর জেনেছে। এপিডিআর-এর উদ্যোগে নানা সভায় এসব কথা বলা হয়েছে। এবার আপনারাও জানলেন।

বারো বছর আগে আপনারা পথে নেমেছিলেন ঘরের ছেলে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি ঠেকানোর দাবিতে। এপিডিআর ছিল আপনাদের সঙ্গে। তখন আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতেন যে সে নির্দোষ, কিন্তু নিশ্চিত জানতেন না। এখন জানলেন। আজ আবার এপিডিআর এসেছে আপনাদের পাশে। এবার আপনারা সকলে মিলে ঠিক করুন কী করবেন। আমাদের কাজ আপাতত শেষ। আপনারা কিছু শুরু করবেন কিনা ভেবে দেখুন। আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ছাতনার নাগরিকদের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা এক স্মারকলিপি পাঠ করে শোনান, যাতে ধনঞ্জয়ের ফাঁসির পুনর্বিচার চাওয়া হয়েছে। দেবদুলাল মুখার্জি (দেওঘরিয়া) ধনঞ্জয়ের গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের সাক্ষী হিসাবে আদালতে গিয়ে ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সাক্ষ্যের জোরে প্রমাণ হয় যে ধনঞ্জয় খুনের জায়গা থেকে একটা ঘড়ি চুরি করেছিল। যেহেতু ধনঞ্জয়কে খুন বা ধর্ষণ করতে কেউ দেখেনি, চুরির প্রমাণই হয়ে দাঁড়িয়েছিল খুন-ধর্ষণের প্রমাণ। সেই দেবদুলাল মুখার্জি সভায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে জানান, তিনি পুলিশের চাপে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি ছাতনা থানার সামনে চায়ের দোকান করি। ভোরে দোকান খোলার সময় থানায় আমায় ডাকা হল। যেয়ে দেখছি ধনঞ্জয় বসে আছে। ধনার সঙ্গে গিয়ে কথা বললাম। ওরা বলল জানিস নাকি একে? জানি বলতেই বলল, সই কর। কলকাতায় গিয়ে দেখছি উলটা কেস। আমার দ্বারা চোর প্রমাণ হয়েছে। আর ওইসব হাবিজাবি অভিযোগ ওগুলো আমি কিছুই জানি না, ওর বাড়িও আমি যাইনি। আমায় জবরদস্তি বলা করাইল আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, বাড়িতে আমার সামনে ওকে ধরা হয়েছিল। আর হাতের ঘড়ি বা জামা বা বোতাম ওগুলা এখানে তো সিজ হয়নি, ওগুলা পরে যখন বলেছে সই করে দিয়েছি। আমার দ্বারা চোর প্রমাণ হল। আমাদের এখান থেকে যখন কোর্টে যেতে হয়, তিনদিন আগে তুলে নিয়ে গেছিল। তারপর লালবাজারে আগে কোর্টটা বসল। কোর্ট তৈরি করল — যে এই এই বলতে হবে। তখনই আমি বুঝতে পেরে গেলাম। তার আগে আমি তো এখানে কোর্টে সাক্ষী দিয়েছি, আমি জানি তো। আমি যাইয়ে দেখছি আমাদের আর কেউ নেই, আমি একা। সরকারের যে উকিল সেও দেখছি ওদের ধারে। জীবন বাঁচানোর জন্য ওইভাবে বলে আমি বার হয়ে এসেছি।'

এরপর এপিডিআর-এর বেলিয়াতোড় শাখার তরফে মুক্তারাম ঘোষ বলেন, ধনঞ্জয়কে তো আর ফেরানো যাবে না, সে নেই। কিন্তু আমরা যারা সাধারণভাবে জীবনযাপন করি, আমাদের ভবিষ্যৎটা কী? দেবদুলালবাবু বলে গেলেন তাঁকে পুলিশ কীভাবে শাসিয়েছে। সত্যি কথাটা বলার অধিকার থাকছে না। সাধারণ মানুষ কত কষ্টের মধ্যে রয়েছেন, মানুষের সংসার চালানো দায় হয়ে উঠেছে। তার উপরে আবার যদি এমন উৎপাত করা হয়, তাহলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

ধনঞ্জয়ের বোন শান্তি মুখার্জি বলেন, 'আমি ধনঞ্জয়ের বুন। ছোটো ভাইয়ের পইতার পরের দিন পুলিশ বাড়িতে যায় আর আমার ভাইকে প্রচণ্ড মারধোর করে। বলে যে ধনঞ্জয় এইটিই বটে। কিন্তু সে ধনঞ্জয় ছিল না, ভাই ছিল। আমার ছোটো ভাই বিকাশ। ধনঞ্জয় যে খুনী সেই প্রমাণ কোনোদিনই হয়নি, ধনঞ্জয় এই ধরনের ছেলে কোনোদিনই ছিল না, সে এই কাজ করতে পারে না। কিন্তু আমার

বাবা নির্ধন, ধন ছিল না, গরিব মানুষ। এইজন্য যে-কোনো ভাবে আমার দাদাকে ফাঁসি দিল। ছোটো ভাইকে মারধোর, আমাদিগে অভাষা কুভাষা। গোয়েন্দা বিভাগের যে প্রধান প্রসূন মুখার্জি (শান্তি নামটা ভুল বলেছেন : সেদিন লালবাজারের পুলিশ দলের নেতৃত্বে ছিলেন লালবাজারের পুলিশ অফিসার সুনীল চক্রবর্তী যাঁর বাড়ি ছাতনার কাছে রাঙামাটিতে) বললেন, যদি এটা তোমার হত, তোমাকে কী করতে হত। চল আমরা তুলে নিয়ে যাব। ফুলের মতো মেয়েকে নষ্ট করেছে ধনঞ্জয়। তোমার বাবা মাথায় হাত দিয়ে বলুক যে ধনঞ্জয় এর খুনী নয়। কিন্তু বাবা আমার কিছুই জানে না তাকে মারধোর প্রচণ্ড করা হয়, ভাইকে মারধোর করা হয়। সেখানে আমি ছিলাম আমি পড়ে গেছি। তারপর গয়নার বাস্ক লিয়ে টানাটানি করে বলছে এই তো এই সব ধনঞ্জয় রেখে গেছে। কিন্তু মূলে এসব আমার বৌদির গয়না ছিল। ধনঞ্জয় এমন একজন ছিল যে কোনোদিনের জন্য খারাপ কাজে কিছু থাকে নাই। কোনো অসুবিধার মধ্যে ধনঞ্জয় থাকে নাই। কিন্তু কীভাবে ধনঞ্জয়কে মেরে দিল।

ছাতনা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে চণ্ডীদাস চ্যাটার্জি বলেন, 'ধনঞ্জয় আমার সমবয়সি। আমরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছি, একই সঙ্গে খেলাধূলা করে ছোটো থেকে বড়ো হয়েছি। আমরা মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিলাম এবং প্রতিবাদ করেছিলাম কলকাতায় গিয়ে, কিন্তু ফাঁসি রদ করতে পারি নি। আজকে এই যে বই লিখে প্রচার হচ্ছে, এতে আমাদের দুঃখের দিনেও আনন্দ লাগছে। পেপারে দেখেছিলাম, ফাঁসি হবার দিন ধনঞ্জয় শান্তচিত্তে বলেছিল, আমি গরিব মানুষের ছেলে আমি ন্যায্য বিচার পেলাম না, পুলিশ কমিশনার, তুমি যদি পারো, তা হলে এই রকম নিরীহ গরিব মানুষের সাজা যেন আর না হয়, এইটুকুই দেখবে। সে তো আজ নেই, কিন্তু আমাদের কুলুডিহি গ্রামের, ছাতনাবাসীর, বাঁকুড়াবাসীর যে কলঙ্কের বোঝা, সেটা যদি এঁরা মুছে দিতে পারেন তা হলে হয়তো তার আত্মা একটু শান্তি পাবে।'

রাজেন্দ্রনাথ বাগ এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে বলেন, এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি ক্ষমতায় আসার পর, সাঁইবাড়ি হত্যা, আনন্দমার্গী হত্যা ইত্যাদি তিরিশ চল্লিশ বছরের পুরোনো, নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া কিছু মামলার পুনর্বিচারের জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন। ধনঞ্জয়ের ফাঁসির পুনর্বিচারের জন্য আজকে ছাতনা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে যে দাবি উঠেছে, সেটাই বা হবে না কেন? ২০০৪ সালে আমরা এই গ্রামে এসেছিলাম। তখন আমরা ফাঁসিটা রদ করার চেষ্টা করেছিলাম। সুপ্রিম কোর্টেও একটা মামলা করা হয়েছিল শেষ মুহূর্তে, কিন্তু সেটা খারিজ হয়ে যায়। আজকে আরও অনেক তথ্য সামনে এসেছে। এতে আমাদের সেদিনের সন্দেহগুলো আরও পাকাপোক্ত হচ্ছে। বিনা দোষে একজনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল, এই কথাটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তাকে কলঙ্কের বোঝা নিয়ে চলে যেতে হয়েছে। তার পরিবার পরিজনকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। এটা পুলিশ-প্রশাসন-আদালতের ভুলেই হয়েছে। পুলিশ-প্রশাসন-সরকার-আদালতকে সেই ভুল স্বীকার করে নিতে হবে। কারও সম্মান নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলা যায় না। এই যে এখন নতুন তথ্য হাতে এসেছে, মনে হচ্ছে নির্দোষ নিরীহ একটা লোককে বড়োলোকদের খুশি করার জন্য ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এরকম বহুক্ষেত্রেই ঘটে। বীরভূমে এক তেলকলের মালিক এককাঠা জায়গা দখল করার জন্য ঘরে আগুন লাগানোর অভিযোগ আনে সেই জমিতে যে ছিল তার বিরুদ্ধে। সিউড়ি আদালত তারও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। কিন্তু কিছু তথ্যপ্রমাণ হাজির করার ফলে হাইকোর্টে গত বছর সেই মৃত্যুদণ্ড রদ হয়েছে। কিন্তু যদি কারও মৃত্যুদণ্ড একবার হয়ে যায়, তা হলে নতুন তথ্যের আলোকে সেই মানুষটাকে নির্দোষ মনে হলেও তাকে আর ফেরানো যায় না। এটা একটা বড়ো কারণ, যে জন্য এপিডিআর মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করতে চায়। আজকে যে দরখাস্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর জন্য ছাতনায় তৈরি হচ্ছে, অন্য জায়গা থেকেও সেই দাবি তুলতে এপিডিআর উদ্যোগী হবে।

ধনঞ্জয়ের বন্ধু নির্মল দত্ত বলেন, ক্লাস ফাইভ থেকে আমি ধনঞ্জয়ের সঙ্গে পড়াশোনা করেছি। পাশাপাশি বসতাম, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একসঙ্গে দুজনে টিউশনিও পড়েছি। স্কুলের পর দুজনে দুই লাইনে চলে যাই। একটা গ্রামের ছেলে যে এই ধরনের কাজ করতে পারে, এটা ভাবা যায় না। আর স্কুলেও আমরা কোনো বদমাইসি করলে ধনঞ্জয় আমাদের ওপর রেগে যেত। আমরা বারে বারে বলেছি, ধনঞ্জয়ের নামে অ্যালিগেশন সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্বর্গীয় প্রভাস চ্যাটার্জির নেতৃত্বে ছাতনায় একটা নাগরিক কমিটি করা হয়েছিল। ফাঁসি ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। ফাঁসির আগের দিন ধনঞ্জয়ের বাবার প্রচণ্ড শরীর খারাপ। প্রভাসদা কতগুলো মেডিসিন দিয়ে বললেন, নির্মল তুই ধনঞ্জয়ের বাবাকে এগুলো দিয়ে আয়। তখন কলাইবেড়া থেকে গোটা গ্রামটা ১৪৪ ধারা। পুলিশে ঘিরে রেখেছিল। বলল যেতে দেওয়া হবে না, অসুবিধা আছে। একে ধনঞ্জয়ের এমন অবিচার হচ্ছে, তার ওপর একটা ওষুধ পর্যন্ত নিয়ে যেতে দেবে না। আমি বাধা না মেনে ওষুধ দিয়ে এসেছিলাম। ঘটনা যেখানে ঘটেছিল, সেখানে ধনঞ্জয়ের বন্ধুবান্ধব ওর সঙ্গে যারা ছিল, তারা নিজেদের রাজসাক্ষী বানিয়ে ফেলল, আর ধনঞ্জয় গ্রামের সরল ছেলে সে দোষী হয়ে গেল। কোথায় কোথায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াল। এখানে থানার কাছ থেকে দুজনকে জোর করে সাক্ষী বানানো হল। একজন আমারই বন্ধু দুলাল দেওঘরিয়া, যে এখানে একটু আগে বলে গেল। সে বলল, কী করব, লালবাজারে পুলিশের যেরকম বেড়াজাল, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। আর একজন নন্দগোপাল দেওঘরিয়া, তাকেও জোর করে থানায় নিয়ে গিয়ে সই করিয়েছিল। তখনকার মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য রাস্তায় নেমেছিল, কী করে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি দেওয়া যায়। আমার বন্ধু বলে বলছি না। আমিও একটা বাম কর্মী। এই পশ্চিমবাংলার বুকে গত কয়েক বছর ধরে অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটেছে, তারা পার পেয়ে গেছে। সমস্ত ঘটনা সাজানো ঘটনা। আমার অবাক লাগে, 'মীরা ভট্টাচার্য, হেতাল পারেখের পরিবার বড়োলোক বলে কি আপনি রাস্তায় নেমেছিলেন, কই আর আপনাকে তো রাস্তায় নামতে দেখছি না?' আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ধনঞ্জয়ের পরিবার যদি সচ্ছল হত, তা হলে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হত না, এই সভারও দরকার হত না। আজকে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় একটা কলঙ্ক নিয়ে চলে

গেছে। তার পুনর্বিচারের দাবি নিয়ে যে পথে নামা হয়েছে, তার কলঙ্কমোচনের জন্য আন্দোলন হচ্ছে, আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আর যেন কোনো গরিব ছেলের এই ধরনের শাস্তি না হয়। আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, আপনারা এই আন্দোলনে শামিল হোন।

ধনঞ্জয়ের ছোটো ভাই বিকাশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, পারিপার্শ্বিক এভিডেন্সের ওপর ভিত্তি করে ফাঁসি দেওয়া, তাও চোদ্দো বছর জেল খাটার পর, কী রকম ব্যাপার দেখুন। মুখ্যমন্ত্রী যদি নিউট্রাল থাকতেন, তা হলে এরকম হত না। তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য ফাঁসুড়েকে সঙ্গে নিয়ে সভা করলেন, কান্নায় ভেঙে পড়লেন যে ধনঞ্জয়কে ফাঁসি দিতে হবে। ওদিকে দেখুন মহিলাদের নগ্ন করে করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার বেলায় মীরা ভট্টাচার্যের চোখে জল আসেনি। ১৪ আগস্ট কাকভোরে তাকে ফাঁসি দিয়ে দিতে হবে। কারণ কী তার বাবার কোনো টাকাপয়সা নেই, সে কোনো মন্ত্রী আমলার ছেলে নয়। চোদ্দো বছর কনডেমড সেলে থাকল, বলল সে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তবু তার ফাঁসি হল। তার ওপর আমাদের ওপর পুলিশি অত্যাচার। লালবাজার থেকে গুন্ডাবাহিনী এনে আমাদের পরিবারকে যেভাবে ধোলাইটা করা হয়েছে সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু দাদা, অপরাধের গুরুত্ব যতই বেশি হোক, রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রাণ রক্ষা করা, কারও প্রাণ কেড়ে নেওয়া নয়। একজনকে প্রাণ দেওয়া যায় না, তাই রাষ্ট্র তার প্রাণ কেড়েও নিতে পারে না। রাষ্ট্রপতির কাছে পুনর্বিবেচনার আপিল হল। আমরা সাধারণ মানুষ জানি, পুনর্বিবেচনা মানে আগের বিচার নয়, নতুন করে বিবেচনা। কিন্তু দেখা গেল সেই মৃত্যুদণ্ডই বহাল। এই যে পুনর্বিচারের দাবি নতুন করে উঠছে, আন্দোলন হচ্ছে, আপনারা এর সঙ্গে থাকুন।

ধনঞ্জয়ের মামলা নিয়ে অনেক বছর ধরে অনুসন্ধান করে তার নির্দোষিতার ব্যাপারটা যাঁরা প্রকাশ্যে এনেছেন, তাঁদের একজন হলেন অধ্যাপক প্রবাল চৌধুরী। তিনি বলেন, 'তিন তিনটে আদালত ধনঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করেছিল খুন, ধর্ষণ আর একটা ঘড়ি চুরির অভিযোগে। এর মধ্যে ঘড়ি চুরির ঘটনাটা আপনারা তো শুনলেন, ঘড়ি উদ্ধারের যিনি সাক্ষী ছিলেন তিনি আপনাদের সামনেই এসে বলে গেলেন আসলে কী ঘটেছিল। ধর্ষণের ব্যাপারে আমরা এই মামলার পোস্ট মর্টেম ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করেছি বহুবার, ফরেনসিক এক্সপার্টরা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন শেষ দিকে, তাঁরা সবাই আমাদের যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন সেগুলো খুঁটিয়ে দেখে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার একটুও জায়গা নেই যে কোনো রকম ধর্ষণের ঘটনা এখানে ঘটে থাকতে পারে। ধর্ষণের কোনো ঘটনাই বাস্তবে ঘটেনি। ধনঞ্জয় তো দূরের কথা, কেউই কিছু করেনি। মেয়েটির সঙ্গে কারো কিছু ঘটে থাকতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং ধর্ষণের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সাজানো। তবে খুন একটা ঘটেছিল, সেই নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই, তাই না? তাহলে খুনটা করল কে? এটার জন্য একটা তদন্ত দরকার। আমার সেই তদন্ত করার ক্ষমতা নেই। আমার সেই পুলিশ বাহিনী নেই, আমার ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট নেই। আমি সাধারণ লোক। তবে যতটুকু বলতে পারি, ওইরকম একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে চারতলায় একটা খুন হতে গেলে — যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা সিকিউরিটি গার্ড পাহারায় থাকে, লিফটে করে লোকে ওঠানামা করে — সেখানে ভিতরের কোনো লোক না থাকলে এরকম একটা খুন হওয়া সম্ভব নয়। বাড়ির দরজা আটকানো ছিল, বাইরের কেউ এলে ভিতর থেকে দরজা খুলে না দিলে কেউ সেখানে ঢুকতে পারবে না। দরজায় কাচের চোখ ছিল, তাই দরজা না খুলেও ভিতর থেকে দেখে নেওয়া যেত বাইরে কে এসেছে। কাজেই পরিবারের লোকেরা কোনোভাবে জড়িত না থাকলে এরকম খুন হওয়া সম্ভব নয়।

যেটা খুব অদ্ভুত সেটা হল হেতালের মা বেরিয়ে গেছিলেন, ফিরে এসে দরজায় দু-চারবার ধাক্কা দিয়েই দরজা ভেঙে ফেলতে বলেন। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ফ্ল্যাটের সদর দরজা ভাঙার নির্দেশ। আমার বাড়িতে এরকম হয়েছে — শীতকালে বাড়িতে কেউ নেই, আমি একা ঘুমিয়ে পড়েছি, ফিরে এসে তারা দরজা ধাক্কিয়েছে কিন্তু আমার ঘুম ভাঙেনি। এরকম অবস্থায় বাড়ির লোক ডাকাডাকি করবে, আওয়াজ করবে, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে দরজা ভেঙে ফেলবে এরকম কখনো আমার বাড়িতে হয়নি। এরকম হয় না কোথাও। তাই দরজা এত তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেলা খুব অস্বাভাবিক। একটু ভালো করে তলিয়ে দেখলে পরিবারের লোকেদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এই মামলার তদন্তের একটা অদ্ভুত চরিত্র হচ্ছে, বাড়ির লোককে সবসময় তদন্তের বাইরে রাখা হয়েছে। ঠিক যেমন তদন্তের আগেই প্রথম দিন থেকে ধনঞ্জয়কে অপরাধী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তেমনি পরিবারের লোকেরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ সেটা প্রথম দিন থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছে। পুনর্তদন্ত হলে এগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। খুন তো একটা হয়েছে। ধনঞ্জয় যদি নিরপরাধ হয় তবে সত্যটা কী, সেটা মানুষের জানার অধিকার আছে বলে মনে হয় আমার। সেজন্য এই পুনর্তদন্তের আবেদন, যেটাতে আপনারা সবাই সই করছেন, তার একটা অংশ হল প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসুক, আসল অপরাধী চিহ্নিত হোক।

পুনর্তদন্তের ব্যাপারে একটা জিনিস আপনাদের জানিয়ে রাখা দরকার। দিল্লির একটা মানবাধিকার সংগঠন আছে, পিপলস ইউনিয়ন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস (পিইউডিআর, এখানকার এপিডিআরের মতো), ওরা ধনঞ্জয়ের ফাঁসি ঠেকানোর চেষ্টা করেছিল ২০০৪ সালে। আমাদের অনুসন্ধানের পরে গত সেপ্টেম্বর মাসে তারা একটা পুস্তিকা বের করে ধনঞ্জয়কে নির্দোষ বলে দাবি করেছে আর মামলার পুনর্তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তাদের দাবি, সুপ্রিম কোর্টকে স্বীকার করতে হবে যে তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর ধনঞ্জয়কে বেকসুর ঘোষণা করতে হবে। কাজেই আদালতের কাছে পুনর্তদন্তের একটা দাবি ইতিমধ্যেই উঠেছে।

আপনারা আবেদনটা করছেন রাজ্য সরকারের কাছে। এখন প্রশ্ন হল, মৃত্যুদণ্ড যখন কার্যকর হয়, তখন দায়িত্বটা কার। অন্য সব অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত দণ্ড দেয় এবং সেই দণ্ড কার্যকর করে সরকার। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। আপনারা সবাই জানেন, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়ে যাবার পর রাজ্যপালের কাছে, রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করা যায়। তাঁদের আইনি পরামর্শ

দেবার লোক আছে। কাজেই মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে আদালতই যে শেষ কথা সেটা কিন্তু বলা যায় না। রাজ্য সরকারের একটা ভূমিকা আছে এবং শেষ কথাটা রাজ্যই বলে। রাষ্ট্রই বলে। কাজেই পিইউডিআর আদালতের কাছে যে দাবি তুলেছে তার সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছে আপনাদের এই দাবিটা খুব যথার্থ। দুটো দাবি পাশাপাশি হওয়া দরকার। আদালত এবং সরকারের এখানে সমান দায়িত্ব আছে।

ধনঞ্জয় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দিল্লিতে একজন আইনজ্ঞ, তাঁর নাম অনুপ সুরেন্দ্রনাথ, তিনি সারা ভারতবর্ষে যত মৃত্যুদণ্ড হয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তিনি আমাদের বলেছেন, ফাঁসির সাজা পাওয়া কয়েকশো আসামী নানা জেলে আছে। তার মধ্যে চল্লিশটিরও বেশি মামলায় তিনি পুনর্বিচার চাইছেন। তাঁর মনে হয়েছে বিচারে ভুল হয়েছে। তাহলে এবার ভেবে দেখুন, দুশোটার মধ্যে চল্লিশটা কেসে তাঁর মনে হয়েছে যে অপরাধী ভুল করে সাজা পেয়েছে। এই অবস্থায় কত ধনঞ্জয় যে চতুর্দিকে রয়েছে আমাদের জানা নেই। কাজেই এটা এমন একটা সংক্রামক ব্যাধি যে তার জন্য একটা প্রতিষেধকের দরকার আছে। আজকের এই সভাটা হচ্ছে সেই প্রতিষেধকের সূত্রপাত। এতদিন পরে হলেও এটার মস্ত বড়ো প্রয়োজন আছে। এটা অনেক দিনের পুরোনো আবর্জনা, কিন্তু আবর্জনাটা এখনও পরিষ্কার করা হয়নি। সেইজন্যেই আজকের সভা। ছাতনা থেকেই একসময় ধনঞ্জয়কে নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আশা করব এই সভা থেকে সেই আন্দোলন পুনর্জীবিত হবে। আপনাদের সেই আন্দোলন অনেক বড়ো আকার নেবে। এই বড়ো অন্যায়টাকে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটি থেকে সরিয়ে দেবে।

আর একটা কথা আপনাদের বলা দরকার। ২০০৪ সালে আমরা টেলিভিশন দেখেছি, কাগজ পড়েছি। তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। নানা রকম প্রচার হয়েছিল যার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু ধর্ষণ নয়, এরকম প্রচার হয়েছিল যে খুনের পর নাকি ধর্ষণ হয়েছে। এরকম প্রচার হয়েছে যে মেয়েটির বয়স নাকি ছিল চোদ্দো বছর। এগুলো একটাও সত্যি কথা নয়। আদালতের নথিপত্রে, ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টে, ফরেনসিকে কোথাও এরকম কোনো তথ্য নেই। এগুলো ছিল মিথ্যা প্রচার। উচ্চশিক্ষিত মানুষরা যারা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং সেলিব্রিটি তাঁরা এই সমস্ত প্রচার করেছেন। ২০০৪ সালের ২৫ জুন ফাঁসিটা হবার কথা ছিল। সেটা যখন পিছিয়ে গেল, তার পরের দিন ২৬ জুন একটা সভা হয়েছিল। সেখানে বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। মীরা ভট্টাচার্য, রূপা গাঙ্গুলি, সুজন চক্রবর্তী — বিভিন্ন দলের লোকজন সেখানে ছিলেন। তাঁরা এইসব অবান্তর মিথ্যা কথাগুলো বলেছিলেন। এই ধরনের প্রচার যখন হয়, সেটা প্রত্যন্ত গ্রামে ডাইনী প্রথার কথা মনে করিয়ে দেয়। ডাইনি প্রথায় কোনো একটা মানুষকে হত্যা করার জন্য কোনো একটা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তারপর একটা বিরাট প্রচার হয়। প্রচারের মাধ্যমে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় যাতে যাকে ডাইনী বলা হচ্ছে তার মৃত্যুদণ্ডটা কার্যকর করা হয়। কলকাতা শহরে সেবার যে প্রচারটা হয়েছিল সেটা একমাত্র সেই ডাইনী প্রথার সঙ্গেই তুলনীয়। আমার মনে হয় ছাতনাবাসীর দায়িত্ব আছে কলকাতার সেই ডাইনী প্রথাটাকে রদ করার। কলকাতার লোকেরা নানা জায়গায় ডাইনী প্রথা বন্ধ করার জন্য অনেক আন্দোলন করেছেন। এবার কলকাতার ডাইনী প্রথা বন্ধ করার আন্দোলন হোক এই ছাতনা থেকে।'

এপিডিআর-এর বেলিয়াতোড় শাখার তরফে বঙ্কেশ্বর রায় ধনঞ্জয়ের ফাঁসির পুনর্বিচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করাও কেন দরকার সেই যুক্তি দেন। তিনি ডাইনী প্রথার বিশেষ কিছু সাম্প্রতিক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে সব ডাইনী প্রথা বন্ধ করার ডাক দেন।

গোটা সভাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন এপিডিআর-এর অরিজিৎ গাঙ্গুলি।